ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1123-1133
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্র: আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম ও সমাজদৃষ্টির পুনর্মূল্যায়ন

সৌরভ মুখার্জি, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 14.05.2025; Send for Revised: 17.05.2025; Revised Received: 26.05.2025; Accepted: 28.05.2025; Available online: 31.05.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The representation of female characters in Bengali novels has undergone significant transformation over time. Traditionally, women were depicted either as icons of purity, objects of desire or passive elements within the narrative. However, in the works of Bani Basu, this conventional portrayal is radically challenged. Her female characters emerge as self-aware, resilient, and assertive individuals who, through their experiences, consciousness, and struggles, seek and often attain a distinct sense of identity. They are not merely literary embellishments but powerful reflections of social and historical realities. From a feminist theoretical perspective, Bani Basu's women are not symbols of oppression but agents of change. Their journey— from the primitive social order to modern urban civilization— encapsulates the broader trajectory of women's quest for selfhood. In her narratives, this evolution is rendered with depth and nuance. As such, her female characters transcend the boundaries of fiction to become vital documents of socio-cultural and historical consciousness. Her novels mark a distinct and original turn in Bengali literature, offering a new lens for understanding gender, identity and resistance.
Keywords: Feminism, Linga Porichoy, Pitritontro, Narir Songram, Naribadi Drishtivônggi, Sahityik Protirodh

বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে নারীচরিত্রের ভূমিকা সময়ের সাথে সাথে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। কখনো তারা পবিত্রতার মূর্তি, কখনো ভোগ্যবস্তু, আবার কখনো সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাণী বসু এই ধারাবাহিকতাকে ভেঙে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। তার রচনায় নারী কেবল গল্পের অলঙ্কার নয়, বরং নিজস্ব বোধ, অনুভব ও লড়াইয়ের মাধ্যমে আত্মপরিচয়ের সন্ধান করে।

বাণী বসুর উপন্যাসগুলিতে নারীচরিত্র সময়, সমাজ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের নতুনভাবে নির্মাণ করে। এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কীভাবে তার উপন্যাসে নারীচরিত্র আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তরের মাধ্যমে উঠে এসেছে।

নারীবাদ (Feminism) একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মূল উদ্দেশ্য নারী- পুরুষের সমতা, অধিকার ও মর্যাদার প্রতিষ্ঠা। এটি কেবল নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বৃহত্তর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ডাক। নারীবাদ নারীকে দুর্বল, অক্ষম ও অধীনস্থ ভাবার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং নারীকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে মানবিক মর্যাদার স্থান দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করে।

Gerda Lerner তাঁর "Creation of Patriarchy" গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন যে, পিতৃতন্ত্র একটি সাংগঠনিক কাঠামো— যেখানে নারীকে একটি প্রান্তিক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে পুরুষ কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে Simone de Beauvoir-এর "The Second Sex" নারীবাদী তত্ত্বে যুগান্তকারী অবদান রাখে। তিনি বলেন, “Man is defined as a human being and a woman as a female— whenever she behaves as a human being she is said to imitate male,”[১]
অর্থাৎ নারী যখন নিজের স্বতন্ত্র মানবিক পরিচয় তুলে ধরেন, তখন সমাজ তাঁকে পুরুষসুলভ আচরণের দোষ দেয়। এই মন্তব্য নারীর অবস্থান ও আত্মপরিচয়ের সংকটকে গভীরভাবে তুলে ধরে।

নারীবাদী চিন্তাধারার গোড়াপত্তন হয় Mary Wollstonecraft-এর "A Vindication of the Rights of Woman" গ্রন্থে। তিনি নারীকে শিক্ষা ও যুক্তিবোধের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তোলার কথা বলেন, যা পরবর্তী নারীবাদী আন্দোলনের ভিত গড়ে দেয়। নারীবাদ কোনো একক মত নয়, এটি বহুস্তরীয়, বহুমুখী ও বহুপ্রবাহের মেলবন্ধন—যেখানে রয়েছে লিঙ্গ, শ্রেণি, জাতি ও সংস্কৃতিভেদে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণের প্রেক্ষিত।

এই নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি কথাসাহিত্যে শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বাণী বসুর উপন্যাসসমূহে। তাঁর লেখায় নারীর অস্তিত্ব, আত্মপরিচয় ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে গভীর বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যেমন, ‘অষ্টম গর্ভ’ উপন্যাসে মাতৃত্ব, নারীত্ব এবং শরীরী রাজনীতির জটিল সম্পর্ক তুলে ধরেছেন, যেখানে নারী তার নিজের শরীর ও জন্মদানের অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

বাণী বসুর ‘মৈত্রেয় জাতক’, ‘জন্মভূমি মাতৃভূমি’, কিংবা ‘অশ্বযোনি’ উপন্যাসে বারবার উঠে আসে নারীর অস্তিত্বের প্রশ্ন। তাঁর নারীচরিত্রেরা কেবল ভুক্তভোগী নয়, বরং সংগ্রামী, প্রশ্নকারী এবং অধিকারের দাবি জানানো মানুষ- যাঁরা সমাজের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নিজের জন্য জায়গা করে নিতে চায়। এই চরিত্রেরা নারীবাদী চিন্তার বাস্তব প্রতিফলন- তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করে নিজেদের জীবনের নিয়ন্ত্রক হতে চায়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, নারীবাদ একটি সামাজিক বিপ্লবের নাম, যা কেবল নারীর স্বাধীনতা ও অধিকার নিয়েই নয়, বরং মানবসমাজকে ন্যায্য, সমানুভূতিসম্পন্ন এবং আত্মিকভাবে সংহত এক কাঠামোতে পুনর্গঠনের আহ্বান জানায়। বাণী বসুর উপন্যাসসমূহ এই আহ্বানকে সাহিত্যিক ভাষায় রূপ দেন, যা পাঠকের মনে ভাবনার উদ্রেক করে এবং নারীর অবস্থান নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

বাণী বসুর উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলির আত্মপ্রকাশ, তাদের জীবনের সংগ্রাম এবং সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর উপন্যাসগুলিতে নারীরা বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছে, যা তৎকালীন সমাজের নারীদের প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রাচীন সাহিত্যে নারী ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী, কিন্তু বাণী বসুর লেখায় নারীরা নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচিতি তৈরি করেছে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রেরা প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে। কেউ নেতৃত্ব দিয়েছে, কেউ সমাজের নিয়ম ভেঙেছে, আবার কেউ নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছে।

বাণী বসু তাঁর উপন্যাসগুলোতে নারীদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসের মাতঙ্গী, মধুরা, এবং রঙ্কার মতো নারীরা আদিম সমাজে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। একইভাবে, 'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসের নগরশোভিনী, প্রব্রাজিকা এবং দাসীর জীবন তৎকালীন সমাজে নারীদের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়।

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীরা প্রায়শই সমাজের গতানুগতিক ধারণা এবং প্রত্যাশাগুলির বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে। তারা শুধু নীরব দর্শক নয়, বরং সক্রিয়ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এর মাধ্যমে, লেখিকা সমাজে প্রচলিত নারী সম্পর্কিত ধারণাগুলির পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন এবং পাঠকদের এই বিষয়ে নতুন করে ভাবতে উৎসাহিত করেছেন।

এই নারীদের জীবনকাহিনি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং বৃহত্তর সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের অংশ। বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলির আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম ও সমাজদৃষ্টির পুনর্মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক অবদান।

'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে আদিম সমাজের নারীরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারা সন্তান ধারণ করে, খাদ্য সংগ্রহ করে এবং গোষ্ঠীর নেতৃত্ব প্রদান করে। নারীর শারীরিক সক্ষমতা এবং মানসিক দৃঢ়তা এখানে সমাজের রক্ষক ও চালিকা শক্তি হিসেবে চিত্রিত হয়। তবে সময়ের সাথে সাথে পুরুষতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নারীর সেই ক্ষমতা কেড়ে নেয়।

'খনামিহিরের ঢিপি' উপন্যাসে মাতঙ্গী, মধুরা এবং রঙ্কা এই নারীরা আদিম অরণ্যজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তারা শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় ছিলেন এবং গোষ্ঠীর নেত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে গোষ্ঠী পরিচালিত হতো, এবং তারা সন্তান জন্ম দেওয়া, যুদ্ধ পরিচালনা করা, শিকারের মাংস বিতরণ করা এবং গোষ্ঠীর তৃষ্ণা নিবারণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করতেন। এই নারীরা এতটাই শক্তিশালী ছিলেন যে, পুরুষরা তাদের শক্তির উৎস দেখে অবাক হতো। গোষ্ঠীনেত্রী হিসেবে নারীরা শিকার, যুদ্ধ, বিতরণ ও পরামর্শে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তৎকালীন সমাজে লিঙ্গ বিভাজনের নীতি ছিল না এবং অসমবন্টন ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। নারীরা যৌনক্ষুধা তাড়িত হলে বিনা দ্বিধায় পুরুষকে ব্যবহার করে কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতেন। পছন্দের পুরুষকে নিজগৃহে বসবাসের জন্য আহ্বান জানানোর স্বাধীনতা তাদের ছিল। তৎকালীন সমাজে শ্লীলতা- অশ্লীলতা বা নৈতিকতা-অনৈতিকতার স্থান ছিল না; হৃদয়ের সম্মতিই ছিল নারী-পুরুষের মিলনের একমাত্র শর্ত। নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকাই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ, এবং গোষ্ঠীর সবচেয়ে শক্তিশালী সদস্যই উচ্চতম পদে আসীন হতেন, লিঙ্গ রাজনীতি সেখানে অনুপস্থিত ছিল। দৈহিক ও মানসিক সক্ষমতাই ছিল যোগ্যতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি, এবং নারীরা তাদের শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চপদ লাভ করতেন। একদিকে তারা ছিলেন গোষ্ঠীর পরিচালক, পালক ও রক্ষাকর্ত্রী, অন্যদিকে তারা ছিলেন সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা possessed করতেন, যা পুরুষদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করত।

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়-

"নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনার রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।"[২]

'মৈত্রেয় জাতক' উপন্যাসে গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে । এই উপন্যাসে নারীদের বিভিন্ন বৃত্তি এবং সমাজে তাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ধাত্রীর জীবিকা ছিল নারীদের গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। রাজপরিবার এবং অভিজাত পরিবারের শিশুরা অঙ্কধাত্রী, মন্ডনধাত্রী ও ক্রীড়াপণিক ধাত্রীর কোলে মানুষ হতো। অঙ্কধাত্রী অর্থাৎ দুধ-মা শিশুদের লালন-পালন করত। মন্ডনধাত্রী শিশুদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সজ্জিত করত। ক্রীড়াপণিক ধাত্রীর কাজ ছিল শিশুদের সাথে খেলা করা। এদের মধ্যে কেউ স্বাধীন আবার কেউ দাসী ছিলেন, তবে দাসীরা মুক্তি কিনে স্বাধীন হতে পারতেন।

তৎকালীন সমাজে রাজাদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, যা রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চালে ব্যবহৃত হতো। নারীদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা হতো। বিদ্বান নারীরা সংসারের কাজ শেষ করে শ্রেষ্ঠিকন্যাদের বিদ্যাব্যাস এবং আচার্যার ভূমিকা পালন করতেন। নারীরা গান্ধর্ব বিবাহ করতেন এবং স্বয়ংবরা হওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল। তবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অপুত্রক স্ত্রীদের স্বামীরা ইচ্ছামতো ত্যাগ করতে পারতেন, এবং শাস্ত্র অনুযায়ী, যে স্ত্রী শুধু কন্যাসন্তান জন্ম দিত তাকেও বারো বছর পর ত্যাগ করা যেত।

সমাজে নারীদের অধিকার প্রায় অনুপস্থিত ছিল, তবে অনার্য ও বনবাসী নারীরা তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ছিলেন। সেখানে নারী-পুরুষের জন্য একই নিয়ম ছিল এবং বিবাহ-পূর্ববর্তী সহবাস নিন্দনীয় ছিল না। অনার্য নারীরা অপরিচিতদের সাথে সহজে মিশতে পারতেন, যা শিক্ষিত আর্যদের মধ্যে দেখা যেত না।
তিনি বিশাখার জবানিতে বলেছেন-

> "জানো না, কৌমার্যরক্ষার জন্য আমাদের পিতা-মাতা অনুক্ষণ আমাদের প্রহরা দিয়ে রাখেন। জানো না, স্নানাগারে, শয়নকক্ষে পর্যন্ত দাসীরা আমাদের অনুসরণ করে। বিন্দুমাত্র সংশয় হলে স্বয়ং পিতা পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখতে কুণ্ঠা বোধ করেন না যে আমরা প্রকৃতই কুমারী কি না। যতই আদরিণী হই তিষ্য, আমরা, এই সাকেতের, রাজগৃহের, শ্রাবস্তীর, বারাণসীর সর্বত্র যেখানে যে আছি যত নারী, সবাই বন্দিনী। আভিজাত্য একটা ছলমাত্র। সুকৌশলে বন্দিত্ব আমাদের অভ্যাস করিয়ে নেওয়া। স্বর্ণশৃঙ্খলের যন্ত্রণা, আভিজাত্য-সর্পের দংশন-বেদনা যে কী ভাবে হাসিমুখে সহ্য করতে হয়, শ্রেষ্ঠীকন্যা তা জানে।"[৩]

'পঞ্চম পুরুষ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হলো এষা খান। এষা নামের এই নারী চরিত্রটি উপন্যাসের অন্যান্য পুরুষ চরিত্রদের সহজেই আকৃষ্ট করে তোলে। উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা দেখি, এষার উপস্থিতিতে বিভিন্ন সম্পর্কে এক নতুন মোড় আসে।

অহর্ তার আট বছরের বিবাহিত জীবন এবং সুখের দাম্পত্য ছেড়ে এষার হাত ধরে বেরিয়ে আসতে চায়। নীলম, একজন সফল শিল্পপতি, গান এবং রঙের মাধ্যমে এষার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। এমনকি, ব্যক্তিহীনতার এক পর্যায়ে পৌঁছানো সীমাও এষার সান্নিধ্যে এসে ফিরে পায় তার আত্মবিশ্বাস।

এষা যেন এক রহস্যময়ী নারী, যার আকর্ষণ এতটাই প্রবল যে পুরুষরা তাদের নিজেদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে আসতেও দ্বিধা বোধ করে না। এখানে এষা যেন এক চুম্বক এবং পুরুষেরা তার আকর্ষণে আসা লোহার কণার মতো।

বাণী বসুর 'পঞ্চম পুরুষ' উপন্যাসটি একটি শিক্ষিতা, আত্মনির্ভর, স্বাধীনচেতা নারীর আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং সমাজবদ্ধ নারীর অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র এষা খান একজন স্বশিক্ষিত, প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারী, যিনি শুধু পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মুখোমুখি হন না, সেই কাঠামো ভেঙে নিজেকে নতুনভাবে গড়ে তোলেন।

এই উপন্যাসের অন্যতম মূল বক্তব্য হলো, নারীর নিজস্ব ইচ্ছা, চাওয়া-পাওয়া ও মানসিক প্রস্তুতি ছাড়া কোনো সামাজিক ভূমিকা যেমন মাতৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া চলে না। সমাজ যেখানে নারীর পরিচয়কে প্রধানত স্ত্রী ও মা এই পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়, সেখানে এষা নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি মনে করেন, শুধু শারীরিক প্রক্রিয়া নয়, মাতৃত্ব একটি মানসিক প্রস্তুতির বিষয়, এবং এই প্রস্তুতি না থাকলে তা এক প্রকার শোষণ ও যান্ত্রিকতার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

উপন্যাসে বিয়েকে ঘিরে সমাজের যে অর্থনৈতিক ও শ্রমভিত্তিক হিসাব-নিকাশ, সেটিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মেয়েদেরকে কেবল পণের মাধ্যমে কেনা, বা তাদের শ্রমকে বিনা পারিশ্রমিকে কাজে লাগানো- এই বাস্তবতাকে উপন্যাসে নির্মম ও স্পষ্ট ভাষায় চিত্রিত করা হয়েছে। এষার বিয়ের অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়, তার শ্বশুর- শাশুড়ি তাকে গৃহপরিচারিকা ও সেবিকার ভূমিকায় দেখতে চেয়েছিলেন, তার স্বতন্ত্র সত্তাকে স্বীকৃতি দেননি।

উপন্যাসে সমাজের প্রচলিত 'স্বামীনির্ভরতা' বা 'নারী মানেই পুরুষের আশ্রিত' এই ধারণারও সমালোচনা করা হয়েছে। অনেক নারীই নিজেদের স্বামী বা পুরুষ অভিভাবকের সম্পত্তি ভাবতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, যা এক ধরনের সামাজিক মানসিকতা। বাণী বসু এই ধারণার পেছনের শোষণ কাঠামো বিশ্লেষণ করেন এবং নারীর আত্মনির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

এষার চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন, নারী কেবল আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয় না- তার মধ্যে যুক্তি, অভিজ্ঞতা, আত্মবিশ্লেষণ এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা রয়েছে। এষা প্রেমকে অতিক্রম করে নিজেকে খুঁজে পায়, এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। সে জীবনের প্রতি তীব্র কৌতূহল ও বোধ নিয়ে এগিয়ে চলে, কোনো একক সম্পর্ক বা নির্দিষ্ট ভূমিকার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখে না।

উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র- মহানাম, অরিত্র, বিক্রম, নীলম, সীমা ও সমিদ্ধাও সমাজের বিভিন্ন অবস্থান, চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে। তবে উপন্যাসের কেন্দ্রে যে আত্মচেতা নারী- তিনি নারী মাত্রের অভিজ্ঞতা ও সংগ্রামের এক প্রতীক হয়ে ওঠেন।

সব মিলিয়ে, 'পঞ্চম পুরুষ' একটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক উপন্যাস, যা নারীর আত্মপরিচয়, স্বকীয়তা ও নিজের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেকে নির্মাণ করার প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। বাণী বসু এই উপন্যাসের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, নারী কেবল সমাজের একটি ভূমিকা পালন করে না—সে নিজেই একটি পূর্ণ, আত্মসচেতন, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ, যার চিন্তা, অনুভব ও সিদ্ধান্ত স্বাধীন।

এষা যখন প্রাক্তন প্রেমিক অরিত্রর কাছে বেড়াতে যায় তখন অরিত্রকে সে বলে ওঠে-

> "তোমাকে চাওয়া আমার সম্পূর্ণ নিঃশেষ না হলে আমি আসতামই না অরি। আসতে পারতামই না। তোমাকে চাইলে অপমান, প্রত্যাখ্যান, ব্যবহৃত হবার বেদনা এসব টাটকা ক্ষতের মতো দগদগে থাকত। এসবের খুব স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে। তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারছি।... ওই সব অভিজ্ঞতা পেরিয়ে আসতে পেরেছি বলেই তো আমি আমি।... আমি অভিজ্ঞতার জন্য ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, একেক সময় মনে হয় যদি আমার একশোটা মন থাকত তাহলে... জীবনকে গরুষে গণ্ডুষে পান করতে জন্মের পর জন্ম একটা অভিজ্ঞতাকেই উলটে-পালটে দেখতে কেটে যায়। উদ্বৃত্ত তো কখনও থাকে না। সব সময়েই যেন কম পড়ে যায়।"[৪]

এর পরেই এষাকে আবার বলতে শুনি-

> "আমার এই ঐশ্বর্য তবে আমি কাকে দেব? দশ হাতে দান করলেও এ যে শেষ হবার নয়। আমি কি তবে চিরকাল এমনই উদ্বৃত্ত থেকে যাব। চিরটাকাল? এ কেমন নিষ্ঠুর নিয়তি?"[৫]

আরও বলেছে-

> "পুলিশ এবং মিলিটারি ধরো আমাদের সবার রক্ষার দায়িত্বে আছে। তাই বলে কি জনসাধারণকে তারা বস্তু ভাবে, নিজেদের সম্পত্তি ভাবে?নিজেকে স্বামীর বা অন্য কোনও পুরুষের মুখাপেক্ষী ভাবতে মেয়েরা এক ধরনের গৌরব বোধ করে।... নিজেকে স্বামীর সম্পত্তি ভাবতে গর্ব হয়।"[৬]

'গান্ধর্বী' বাণী বসুর এক উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, যেখানে সঙ্গীতের জগৎ, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, শোষণ ও স্বাধীনতার লড়াই এবং আন্তঃনারী সম্পর্ক একটি গভীর অনুভবের সাথে উপস্থাপিত হয়েছে। "গান্ধর্বী" উপন্যাসটির মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র অপালা দত্তগুপ্ত, এক সময়ের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী, যার বিবাহ পরবর্তী জীবন তাকে সঙ্গীতচর্চা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সংসারের দায়িত্ব, শ্বশুরবাড়ির অবদমন এবং দাম্পত্য জীবনের সীমাবদ্ধতা অপালার শিল্পীসত্তাকে যেন স্তব্ধ করে দেয়। অপালার গানের সাধনা, তার আত্মপরিচয়ের মূলে থাকা সত্তাটি চাপা পড়ে যায় গৃহস্থালির যাঁতাকলে।এই দমবন্ধ অবস্থান থেকে তাকে টেনে বের করে আনে তার গুরুভগিনী ও বন্ধু মিতুল (মিতশ্রী ঠাকুর)। মিতুল শুধু একজন সহচরী নন, বরং একজন সংগ্রামী নারী, যিনি অপালার প্রতি তার স্নেহ, সম্মান এবং দায়িত্ববোধ থেকে তাকে আবার সঙ্গীতের জগতে ফিরিয়ে আনেন। তার উদ্যোগেই অপালা একটি ছায়াছবিতে কণ্ঠদান করেন এবং আবার খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেন। মিতুল অপালাকে শেখায়– একজন নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা কতটা জরুরি।অপালার অন্যতর শক্তি হয়ে ওঠে তার মেয়ে টিটু, যে মায়ের দুঃখ, চুপচাপ সহ্য করার অভ্যেস ও আত্মত্যাগকে দেখতে দেখতে বড় হয়েছে। টিটু চায় তার মা যেন নিজের শিল্প ও স্বত্বাকে ভালোবাসে, অন্যদের মতামতের

তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছেমতো বাঁচতে শেখে। টিটু মায়ের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতায় নজর রাখে, প্রতিবাদ করে যখন তার মায়ের প্রতিভা ও পরিশ্রমকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অবহেলা করে। উপন্যাসে অপালার সঙ্গে এক সময়ের সহশিক্ষার্থী ও সহশিল্পী সোহম- এর পুনর্মিলন ঘটে এক সঙ্গীতসভায়। এই পুনর্মিলনে কোনও যৌনতা নেই, আছে সহমর্মিতা, রসাস্বাদনের এক অভিন্নতা, যা অপালার স্বামী শিবনাথের মনে ঈর্ষার জন্ম দেয়। কিন্তু টিটু বুঝতে পারে– অপালা ও সোহমের সম্পর্ক নিখাদ শিল্পীসত্তার মিলন.।উপন্যাসের সংযোজন অংশে প্রকাশ পায় যে কাহিনির কথক আসলে টিটু নিজেই। মা অপালার জীবনের সমস্ত না- বলা কথা, অবদমন, শিল্পযন্ত্রণার নীরব ইতিহাস সে নিজের চোখে দেখে এবং তা লেখার মাধ্যমে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। এইভাবে 'গান্ধর্বী' হয়ে ওঠে এক নারীর শিল্পসত্তা উদ্ধারের কাহিনি—যেখানে দুই নারী, মিতুল ও টিটু, অপালার সহযোদ্ধা, সহচরী এবং স্নেহশীল বন্ধু।

বাণী বসু বললেন -

> "অপালা এখন শ্যাওলা- ধরা ডোবা, বা লবণ হ্রদ, যার ভেতরে ভেতরে সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের একটা গোপন রাস্তা আছে, কিন্তু অব্যবহারে সেটা বুজে এসেছে।... রবিশংকর। বিলায়েত! ভীমসেন! গিরজা দেবী! বিসমিল্লা! নিখিল ব্যানার্জী! সব, স-ব হারিয়ে গেল জীবন থেকে। খালি এক অন্যমনস্ক বউ দিস্তে দিস্তে রুটি বেলে যায়,... এক অন্যমনস্ক মা ছেলের জামা মেয়েকে পরাতে যায়, মেয়ের বই ছেলেকে পড়াতে বসিয়ে বকুনি খায়, সংসারের নতুন-আসা ধনী ঘরের দুলালী ফর্সা নতুন বউটির সঙ্গে তুলনা ক্রমশই মুখর, আরো মুখর হয়ে উঠতে থাকে।"[৭]

উপন্যাস ‘শ্বেত পাথরের থালা’- য় বাণী বসু একবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল সমাজের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে নারীর বৈধব্যজীবনের নির্মমতা ও বৈষম্যের একটি অসাধারণ ও তীক্ষ্ণ চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে নারী-পুরুষ সমতার কথা উচ্চারিত হচ্ছে, সেখানে সমাজের গভীরে এখনও প্রোথিত রয়েছে নারীর প্রতি শতাব্দীপ্রাচীন বৈষম্যমূলক আচরণ।

এই উপন্যাসে বন্দনার চরিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, কীভাবে একজন শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী নারী কেবল বৈধব্যের কারণে সমাজের নির্মম শাসন ও সংস্কারের শিকার হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরই তার জীবনে আসে শ্বেতবস্ত্র, একঘেয়ে নিরামিষ খাদ্য, নির্জনতা ও শোকাবহ অনুশাসনের এক অন্তহীন পর্ব। অথচ এই একই শোকের পরিস্থিতিতে একজন পুরুষ কখনও এইসব সামাজিক বিধিনিষেধের মুখোমুখি হয় না। বন্দনার মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্ন ও অভ্যন্তরীণ দহন উপন্যাসকে দেয় এক গভীর মানবিকতা ও প্রতিবাদী সুর।

বন্দনার প্রশ্নগুলো এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য বহন করে- কেন একজন স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর পর তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হতে হয়, অথচ একজন পুরুষকে স্ত্রীর মৃত্যুর পর একইভাবে নির্জীব জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয় না? এই দ্বৈত নৈতিকতা এবং বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপরেই ঔপন্যাসিক বিদ্রোহ জানিয়ে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

‘শ্বেত পাথরের থালা’ একটি প্রতীক, যা নারীর বৈধব্যজীবনের একঘেয়ে, নিরুৎসাহ ও বৈষম্যমূলক জীবনযাত্রার রূপক হয়ে ওঠে। এ উপন্যাসে বাণী বসু সমাজের বুকে প্রশ্ন তোলেন- সমানাধিকারের দাবিকৃত সমাজে নারীর প্রতি এমন বৈষম্য কেন এখনও বিদ্যমান? এই প্রশ্নের মধ্য দিয়েই লেখিকা নারীর আত্মস্বর, যুক্তিবোধ ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নতুন আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসেন।

এই উপন্যাস তাই শুধু শোক বা নারী- নির্যাতনের কথা বলে না; এটি এক প্রতিবাদ, এক প্রশ্ন, এক প্রতিরোধ যা নারী পাঠককে যেমন নাড়িয়ে দেয়, তেমনি পুরুষ পাঠককেও সচেতন হতে বাধ্য করে।

একদিন বন্দনার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে-

> "তার স্বামী বিয়োগের শোক যেমন প্রচণ্ড; শাশুড়ির পুত্র শোকও কি তেমনি প্রচণ্ড নয় তাহলে? স্বামীহারা স্ত্রীর রসনা যদি খাদ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাবে বলে লোকে

প্রত্যাশা করে, পুত্রহীনা মায়ের ক্ষেত্রেও তো তাই- ই হবার কথা। আর শুধু মা-ই বা কেন? বাবা? বাবা কি ছেলেকে কম ভালোবাসেন?... বিপত্নীকের দুঃখই বা কম কিসে? আজ যদি অভিমন্যু থাকত, বন্দনা চলে যেত, অভিমন্যুর কি এরকম বুকের শিরছেঁড়া যন্ত্রণা হত না? তার জন্যে কি নিরামিষ হেঁশেল হোত? এমনি আলাদা আয়োজন? আলাদা প্রয়োজন?"[৮]

উপন্যাস 'উত্তরসাধক'- এ বাণী বসু নকশাল আন্দোলন- পরবর্তী বাস্তবতা এবং ইতিহাস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার নিরিখে একটি আদর্শ সমাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেধা ভাটনগর এক সময়ের সক্রিয় নকশাল কর্মী ছিলেন, কিন্তু আন্দোলনের ব্যর্থতা ও লক্ষ্যহীনতার উপলব্ধি থেকে সরে এসে তিনি দশ বছর আমেরিকায় ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে তিনি ইতিহাসের পাঠ শুধু বইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন।

মেধার উপলব্ধি ছিল, আন্দোলন শুধু আবেগ দিয়ে চলে না, প্রয়োজন সুপরিকল্পনা, নেতৃত্ব, সংগঠনের দৃঢ়তা এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার সক্ষমতা। তাই তিনি মনে করেন, কাগজে-কলমে ইতিহাস লিখে যাওয়ার চেয়ে বাস্তব ইতিহাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা আরও জরুরি ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে একজন চিন্তাশীল, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সমাজপরিবর্তকের রূপ দেয়।

এই উপন্যাসে লেখিকা অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ছাত্রসমাজের ব্যবহার ও অবমূল্যায়নের চিত্র তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলন—প্রতিটি আন্দোলনের মূলে ছিল ছাত্রদের প্রাণশক্তি, কিন্তু আন্দোলন ব্যর্থ হলে তার দায়ভার তাদের ওপরেই পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্র তখন তাদের মূল্যায়ন না করে সরিয়ে দেয়। এই বাস্তবতাই মেধার কণ্ঠে উঠে আসে তীব্র হতাশা ও উপলব্ধির রূপে।

উপন্যাসে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল—সমাজের বর্তমান জটিলতা এবং তার মূল কারণগুলোর বিশ্লেষণ। মেধার মতে, আজকের সমাজে অশিক্ষার চেয়েও ভয়ংকর হল কুশিক্ষা। এই কুশিক্ষা ইচ্ছাকৃতভাবে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য, কর্পোরেট লোভের জন্য এবং ক্ষমতার দম্ভ রক্ষার জন্য। ফলে সমাজে বেড়ে চলেছে অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি এবং আত্মধ্বংসের প্রবণতা।

এই সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকেই মেধা বিশ্বাস করেন, প্রকৃত সমাজ সংস্কার সম্ভব কেবলমাত্র সামগ্রিক শিক্ষা, নৈতিকতা, ইতিহাসচেতনা এবং দায়িত্বশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে। 'উত্তরসাধক' উপন্যাসে মেধার চরিত্রটি একজন আত্মানুসন্ধানী, বাস্তববাদী এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা হিসেবে গড়ে উঠেছে, যার জীবনদর্শন এবং কাজ সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের কাছে এক অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে।

এইভাবে, 'উত্তরসাধক' কেবল অতীত নকশাল আন্দোলনের মূল্যায়ন নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য এক বিকল্প পথ নির্মাণের প্রস্তাবও দেয়, যেখানে ইতিহাস শুধুই স্মৃতি নয়, তা হয়ে ওঠে একটি সক্রিয় নির্মাণ প্রক্রিয়া।

মেধাসমস্যহীন সমাজগড়ারজন্যতার বক্তব্য-

"শিক্ষা যদিও কোনও উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত, আমরা জানি আর্থিক উন্নয়ন ছাড়া শিক্ষাও কতদূর ব্যর্থ হতে পারে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ এই তিনটে আমাদের প্রথম লক্ষ্য।"[৯]

বাণী বসুর 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসটি বাংলার ইতিহাসের এক বেদনাবিধুর অধ্যায়কে কেন্দ্র করে রচিত, যেখানে মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশভাগের মতো কালান্তক ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে চিত্রিত করা হয়েছে। লেখিকা কেবল রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক ঘটনাবলির পরিক্রমা করেননি, বরং সেসব ঘটনার প্রভাব কীভাবে ব্যক্তিমানুষের জীবনে, বিশেষ করে নারীর জীবনে, অসহ্য কষ্ট ও নির্যাতনের আবহ তৈরি করেছে, তা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের শুরুতেই দেবহুতি নামক চরিত্রের মাধ্যমে নারীর প্রজনন-ভূমিকার এক নির্মম, অথচ দীর্ঘকাল স্বীকৃত সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে অষ্টমবার প্রসব করে তিনটি সন্তানের জন্ম দিয়ে সে দশ সন্তানের জননী হয়- এই সংখ্যা যেন এক প্রতীক হয়ে ওঠে, যেখানে

নারী কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের এক যন্ত্রে পরিণত হয়। তার নিজস্ব ইচ্ছা, চাওয়া- পাওয়া, স্বপ্ন কিংবা স্বাতন্ত্র্যকে সমাজ স্বীকৃতি দেয় না; বরং তাকে মায়ের ভূমিকাতেই আটকে রাখে। লেখিকা এই চিত্রের মধ্যে দিয়ে নারীর শরীর, শ্রম এবং মানসিকতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এই নারীবাদী দৃষ্টিকোণ ছাড়াও 'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে জাতি, ধর্ম ও শ্রেণিভিত্তিক বিভাজনের ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের করুণ ইতিহাস। মন্বন্তরের সময় বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, তা কেবল খাদ্যের অভাব নয়, মানবিকতারও চরম অবক্ষয়ের চিত্র বহন করে। একইভাবে দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ও ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার ছাপ এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে নিহিত।

উপন্যাসের মাধ্যমে বাণী বসু দেখাতে চেয়েছেন, সময় যতই বদলাক না কেন, নারীর অবস্থান সমাজে এক গভীর সংকটের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে- একদিকে মাতৃত্বের নামে তার শরীরকে ব্যবহার করা হয়, অন্যদিকে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংকটে তার উপর নেমে আসে সহিংসতার সবথেকে নির্মম রূপ। দেবহুতির ক্লান্তি, নিঃস্বতা এবং অনভিপ্রেত মুক্তি যেন সেই নারীদের প্রতীক, যারা ব্যক্তিগত স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক চাহিদার সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

সব মিলিয়ে 'অষ্টম গর্ভ' কেবল একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, এটি এক সামাজিক দলিল, যেখানে নারীর অস্তিত্ব, অভিজ্ঞতা ও যন্ত্রণার কাহিনি জড়িয়ে আছে বাংলার ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়গুলির সঙ্গে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়-

> "বিধ্বস্ত জননী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর প্রথম সুযোগেই নিবিড় ঘুম এসে তাঁকে অধিকার করেছে। স্বপ্নহীন ঘুম। মৃত্যুপম, কিন্তু মৃত্যু নয়। শরীরের প্রতিটি কোষ ঘুমোচ্ছে। তিনি জানেন না তিনি কে, কোথায়। জানেন না তাঁর সাতটি সন্তান আছে এবং এক দফায় আজ তিনি তিন সন্তানের মোট দশ সন্তানের দশভুজা জননী হয়ে গেলেন। আরও জানলেন না বত্রিশ বছর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন সন্তান প্রসবের পর এই আজকের লড়াইয়ে তিনি আর সন্তানধারণের ক্ষমতা হারালেন। এইঅকল্পনীয় মুক্তির কথা জানলে হয়তো তিনি আরও আরও ঘুমোতে পারতেন।"[১০]

বাণী বসুর 'অমৃতা' উপন্যাসে সমাজের এক জ্বলন্ত এবং নীরব সহিংসতা- ভ্রূণহত্যা- কে অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। উপন্যাসটির কাহিনি নারীর শরীর, অধিকার এবং মাতৃত্বের অনুভবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও, এটি আসলে এক বড়সড় প্রশ্ন তোলে—নারী কি নিজের গর্ভে থাকা প্রাণের ওপর সম্পূর্ণ অধিকার রাখে? নাকি সমাজ, পরিবার ও পুরুষতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত সেই অধিকার কেড়ে নেয়?

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অমৃতা একাধারে শিক্ষার্থী, গৃহবধূ এবং সংগ্রামী নারী। তিন বছরের বিবাহিত জীবনে সে কোনো সুখ পায়নি, বরং অনবরত মানসিক নিপীড়নের শিকার হয়েছে। যখন সে গর্ভবতী হয়, তখন তার স্বামী অরিসূদন নিজের সুবিধার কথা চিন্তা করে তাকে গর্ভপাতের পরামর্শ দেয়। কিন্তু অমৃতা এই সিদ্ধান্তকে নৈতিক অপরাধ বলে মনে করে এবং প্রথমবারের মতো সে প্রতিবাদ করে। তার দৃঢ় উচ্চারণ- "কোন অপরাধে তাকে খুন করব?"- এই উপন্যাসের নৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। তার ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, আইন বা সমাজ যাই বলুক না কেন, একজন মায়ের কাছে গর্ভস্থ সন্তান একটি স্বতন্ত্র প্রাণ, যার জীবন নষ্ট করা একপ্রকার হত্যা।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি সমান্তরাল কাহিনি উঠে আসে- দোলা ও অমিতাভের সম্পর্ক। বিয়ের আগেই দোলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে অমিতাভ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে এবং গর্ভপাতের পরামর্শ দেয়। দোলার কষ্ট দ্বিগুণ হয় যখন তার নিজের মা- ও একই পরামর্শ দেয়। কিন্তু দোলা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়—"ওটা

তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা আমার।” এই বাক্যটি কেবল একজন নারীর মাতৃত্ববোধ নয়, বরং সমাজের চরম নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক আত্মসম্মানী প্রতিবাদের প্রতীক।

'অমৃতা' উপন্যাসে বাণী বসু অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যে, নারীর গর্ভে থাকা সন্তানকে কেবল শারীরিক বোঝা কিংবা সামাজিক বিপদ হিসেবে দেখার প্রবণতা আজও সমাজে বহাল রয়েছে। লেখিকা প্রশ্ন তুলেছেন—শুধু নারীই কি এই সিদ্ধান্তের বোঝা বইবে? পুরুষের দায়িত্ব কি কেবল পরামর্শদাতা হয়ে থাকা? এইসব প্রশ্নের মাধ্যমে উপন্যাসটি নারীর স্বাধিকার, মাতৃত্ব এবং মানবিক মূল্যবোধকে এক নতুন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

সার্বিকভাবে 'অমৃতা' একটি প্রতিবাদী কণ্ঠ- যেখানে নারী তার মাতৃত্ব, শরীর ও অনুভবকে ঘিরে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্পষ্ট উচ্চারণ করে। এটি এক সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতার উপন্যাস, যা পাঠককে শুধু কাঁদায় না, ভাবতেও বাধ্য করে।

দোলা প্রতিবাদ জানিয়ে বলে-

> "মা, ওটা তো টিউমার নয়, একটা বাচ্চা আমার... আমার মা ওরা ছেলে মা, বোঝে না এ সবের ইমপর্ট্যান্স, ফিলিং নেই।"[১১]

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় -

> "খেয়ালের বশে তাদের জন্ম দিয়েছে বিলাসী পিতা
> লব কুশে বনে ত্যাজিয়াছে, রাম পালন করেছে সীতা"[১২]

বাণী বসুর 'খারাপ ছেলে' উপন্যাসটি আমাদের সমাজে লুকিয়ে থাকা এক গূঢ় এবং অন্ধকারময় সত্যকে—গণিকালয় ও তার সঙ্গে যুক্ত পুরুষতান্ত্রিক ভণ্ডামিকে— খুলে দিয়েছে নির্মম বাস্তবতায় ও তীক্ষ্ণ নৈতিক দৃষ্টিতে। এই উপন্যাসে নারী শুধু নিজেই অবমানিত নয়, বরং আরেক নারীর জন্য সে দাঁড়ায়— এ এক বিরল উদাহরণ।

উপন্যাসে দেখা যায়, নিখিল, এক শিক্ষিত সমাজভুক্ত ব্যক্তি, যৌনকর্মী বনমালা রাহার সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সন্তানও জন্ম দেয়। কিন্তু বনমালা ও তার সন্তানের কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই। এই অবস্থায়, নিখিলের স্ত্রী জিনা কেবল নিজের অপমান ও ক্ষতির প্রতিকার চায় না, বরং বনমালার মতো সামাজিকভাবে অস্বীকৃত নারীর অধিকার ও মর্যাদার পক্ষেও দাঁড়ায়। তার জোরালো দাবি—“বনমালাকে বিয়ে করতে হবে, স্বীকার করতে হবে সেই নারী এবং তার সন্তান আপনার নিজের।” এখানে জিনার ন্যায়ের চাহিদা শুধু প্রতিহিংসা নয়, বরং এক নৈতিক এবং সামাজিক প্রতিবাদ।

এই উপন্যাসে লেখিকা আমাদের সমাজের সেই কদর্য মুখোশটি সরিয়ে দেন, যেখানে স্ত্রী ও গণিকা উভয়ই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার। একদিকে, সমাজের বুকে শুদ্ধতার প্রতিমা হিসেবে স্ত্রী, অন্যদিকে লালসার উপকরণ গণিকা- কিন্তু পুরুষের জন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। বাণী বসুর জিজ্ঞাসা স্পষ্ট— “যদি নারীদের পবিত্রতার পরীক্ষায় নামতে হয়, তবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও কেন নয়?” লেখিকা প্রশ্ন করেন— নারীদের এক পুরুষের প্রতি অনুগত থাকা যদি ধর্ম হয়, তবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও তা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয় কি?

এই উপন্যাসে নারীর ভূমিকা শুধু দুর্ভোগে ভোগা নয়, বরং প্রতিবাদে বলিষ্ঠ। জিনার চরিত্র এই প্রজন্মের নারীদের সামনে এক সাহসী আদর্শ— যেখানে নারী শুধুই সহ্য করার প্রতীক নয়, বরং বিচার ও ন্যায়ের দাবিদার।

বিচারহীন সমাজে যেখানে গণিকা কেবল ভোগের সামগ্রী, সন্তান কেবল আবর্জনা, সেখানে 'খারাপ ছেলে' এক সাহসী কণ্ঠস্বর— যা বলে, ভোগের পরেও কাউকে 'মানুষ' হিসেবে দেখার দায়িত্ব এড়ানো যায় না।

সার্বিকভাবে, এই উপন্যাসে বাণী বসু দেখিয়েছেন- নারীর লাঞ্ছনা শুধু তার নিজের নয়, সমাজেরও ব্যর্থতা। আর সেই সমাজকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে একজন বিবেকবান নারীই।

> "যুগের পর যুগ অসহায় নারীকে বহুভোগ্যা করেছে বহুলোভী কামুক। ভোগ করে উচ্ছিষ্ট ভাঁড়ের মতো ফেলে দিয়েছে। সমাজ-বেষ্টনীর ভেতরে স্ত্রী, বাইরে গণিকা। কাউকেই তার প্রাপ্য দেয়নি অথচ নিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে সমস্ত সুখ। সুসজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিবদ্ধ সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি-জৌলুস, আবার স্বৈরাচারের নিষ্ঠুর মজা। সন্তান উৎপাদন করেছে গণিকালয়ে, তারপর নামহীন, পরিচয়হীন তাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে পৃথিবীর আঁস্তাকুড়ে। এর জন্য অনেক করুণার অশ্রু বর্ষিত হয়েছে, আহা-উচুতে ভরে গেছে পৃথিবী। কিন্তু বিচারের কথা কেউ কখনও ভাবেনি। ব্যভিচারী নারীকে অক্লেশে শাস্তি দিয়ে গেছে সমাজ। ব্যভিচারী পুরুষের জন্যে ক্ষমা, ভয়, প্রশ্রয়, বড় জোর একটু ঘৃণা। পুরুষেরা তো বহুচারী হয়েই থাকে। আহা। প্রকৃতিই এমন করে তৈরী করেছে এই বেচারা শক্তিমানদের।"[১৩]

কবি নজরুল ইসলামের ভাষায় -

> "সেদিন সুদূর নয়
> যে-দিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পে স্বামীকে পাঠানো চিঠির মাধ্যমে মৃণালদ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিজের অভিমত প্রকাশ করে বলে, "আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।"[১৫]

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্রের উপস্থাপনা সময়ের পরিবর্তন ও সংগ্রামের ইতিহাসকে তুলে ধরে। তারা কেবল নিপীড়নের নিদর্শন নয়, বরং পরিবর্তনের শক্তি। আদিম সমাজ থেকে শুরু করে নগরসভ্যতা এবং আধুনিক নগরজীবন পর্যন্ত নারীর আত্মপরিচয় সন্ধানের এই যাত্রা তার লেখায় গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে। নারীচরিত্রের আত্মপ্রকাশ, সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার এই প্রতিচ্ছবি বাংলা উপন্যাসে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে। বাণী বসুর নারীচরিত্রসমূহ কেবল সাহিত্যের নয়, ইতিহাস ও সমাজ-চেতনারও গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন -

> "নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেন নাহি দিবে অধিকার
> হে বিধাতা?
> নত করি মাথা
> পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
> ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
> দৈবাগত দিনে।"[১৬]

বাণী বসুর উপন্যাসে নারীচরিত্র কেবলই একক ব্যক্তি নয়, বরং একটি সময়, একটি সমাজ ও একটি আত্মসন্ধানী চেতনার প্রতিচ্ছবি। তারা নিপীড়নের প্রতীক নয়, বরং প্রতিরোধ ও পরিবর্তনের প্রতিমূর্তি। এই চরিত্রগুলো সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের অস্তিত্ব নির্মাণ করে, আর সেই পথচলায় তারা কখনো বেদনাহত, কখনো সাহসী, আবার কখনো বিপ্লবী। নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাণী বসুর রচনায় নারীর আত্মপ্রকাশ, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের যে অভিপ্রায়, তা বাংলা সাহিত্যকে একটি নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেয়। তার সাহিত্যে নারী শুধু গল্পের চরিত্র নয়— তিনি এক ভাষ্যকার, এক ইতিহাস, এক সত্য। এই সত্যই বাংলা উপন্যাসে নারীর অবস্থানকে নতুন তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, প্রণব কুমার, সর্বসমাবিষ্ট শিক্ষায় লিঙ্গ প্রসঙ্গ, রিতা পাবলিকেশন, ২০১৯, পৃ. ২১৩
২. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৪
৩. বসু, বাণী, মৈত্রেয় জাতক, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ৬৩
৪. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ২৪৩
৫. তদেব, পৃ. ২৭১
৬. তদেব, পৃ. ২৩৯
৭. বসু, বাণী, গান্ধর্বী, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ১৩২
৮. বসু, বাণী, শ্বেত পাথরের থালা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৭, পৃ. ৩২
৯. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ২৮২
১০. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ৯
১১. বসু, বাণী, দশটি উপন্যাস, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৬, পৃ. ৯৪৭
১২. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৪
১৩. বসু, বাণী, খারাপ ছেলে, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৫, পৃ. ১১৫
১৪. আলি, রমজান, নজরুলের কয়েকটি কবিতা, সদ-উ-তন প্রকাশনী, বর্ধমান, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৫
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, স্ত্রীরপত্র, গল্পগুচ্ছ, সাহিত্যম্ প্রকাশনী, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৬১৪
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪